ইসলামী আকীদা ও প্রচলিত শিরক বিদআত

লেখক
আব্দুল্লাহ আল মামুন
পরিচালক নদওয়াতুল কোরআন অনলাইন মাদ্রাসা
ইমাম ও খতিব গাজীপুর কালিয়াকৈর
মোবাইল নাম্বার ০১৮৮০৫৩৪৮৬৬
ফেসবুক পেজ
https://www.facebook.com/mufti.abdullah.al.mamun.199779
ইউটিউব চ্যানেল
https://youtube.com/channel/UCW2_P0BtWJBTayXW9q02I6w?si=DnSXnLPnf5hn4vN_

প্রকাশনায়

ভূমিকা

ইসলামে আকিদা বিশ্বাস সহীহ্ করা ও সহীহ্ রাখার গুরুত্ব অপরিসীম পক্ষান্তরে যাদের আকিদা বিশ্বাস সহীহ নয় তারাই বাতিলপন্থী সম্প্রদায়। আর যারা হকপন্থী তারা জান্নাতি। পক্ষান্তরে যারা হকপন্থী নয় তারা জাহান্নামী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হকপন্থী ও বাতিল পন্থীদের পরিচয় প্রদান করেছেন এইভাবে হাদিসের ভাষায়,রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ইহুদিরা ৭১ বা ৭২ দলে বিভক্ত হবে। তার মধ্যে এক দল ব্যতীত সকলে জাহান্নামে যাবে সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন সেই জান্নাতি দলটি কারা? রাসূল (সাঃ) বললেন তারা হল ঐ দল যারা আমার ও আমার সাহাবীদের মত ও পথের অনুসারী (তিরমিজি শরীফ) এই হাদিসে হকপন্থী ও জান্নাতি দলের পরিচয় বলা হয়েছে ,যে যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীদের মত ও পথে থাকবে আর এদের কেই বলা হয় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত। এই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত ব্যতীত বাকি সব দল বাতিল সম্প্রদায়। সুতরাং হকপন্থী ও জান্নাতী দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য যেমন ইসলামের সহীহ আকিদা বিশ্বাস তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা বিশ্বাস সম্পর্কে অবগতি লাভ করা প্রয়োজন, ঠিক তেমনি ভাবে সমাজে প্রচলিত শিরক এবং বিদআত থেকে বিরত থাকাও প্রয়োজন। আর এই প্রয়োজনকে সামনে রেখেই **ইসলামী আকীদা ও প্রচলিত শিরক** বিদআত এই বক্ষমান গ্রন্থ রচনা করার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। আর এই কিতাবে ইসলামী আকীদা বর্ণনা করার পর সমাজে প্রচলিত শিরক ও বিদআত নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আমি আশা করি কিতাবটি সকলের জন্য অনেক উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ।

গ্রন্থ সম্পর্কে কিছু কথা

আমি এই কিতাবটি লিখেছি মূলত জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিত তথা স্কুল কলেজ ও ভার্সিটির দ্বীনি ভাই ও বোনদের জন্য যারা ইসলামকে জানতে চান,বুঝতে চান। ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো সহজেই আত্মস্থ করতে চান তাদের জন্য এই কিতাব। বিশেষ করে আমরা যারা কওমী বা আলিয়া মাদ্রাসায় পড়ছি আমরা ইসলামের মৌলিক আকিদাগুলো মূল কিতাব থেকে আয়ত্ব করতে হিমসিম খায় বা বছর শেষে ইসলামি আকিদাগুলো কি তা আমরা বলতে পারি না। কারন **আকীদাতুত ত্বহাবী, আকাইদে নাসাফী, সরহে আকাইদে নাসাফী**, কিতাব গুলো বিস্তারিত ভাবে লেখার কারনে সেখান থেকে ইসলামি আকিদা আয়ত্ব করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য এবং সহজেই ইসলামি আকিদাগুলো আয়ত্ব করার জন্য আমি এই কিতাবটি লিখেছি। এই কিতাবটি পড়লে উপরে উল্লেখিত কিতাব গুলো সহজেই আয়ত্ব হবে ইনশাআল্লাহ।

একজন মানুষ পরিপূর্ণভাবে ইসলাম ধর্ম মানতে চাইলে ঈমান আনার পর মৌলিক ভাবে তাকে তিনটি বিষয় মানতে হবে যথা-

১। ঈমান আনার পর সর্ব প্রথম তার আকিদা বিশ্বাস সহীহ করতে হবে।

২। ঈমানকে নষ্ট করে এমন বিষয় তথা শিরক থেকে বিরত থাকতে হবে।

৩। আমলকে বিনষ্ট করে এমন বিষয় তথা সমাজে প্রচলিত বিদআত ও কুসংস্কার থেকে বিরত থাকতে হবে।

আর এই কিতাবে এই তিন বিষয়কে সহজ,সাবলীল ভাষায় ও সুবিন্যস্ত আকারে সাজানো হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত সূচিপত্র

মূল্য=

বিস্তারিত সূচিপত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়:

ইসলামী আকীদা সমূহ

আকীদা শব্দটি আকদুন থেকে উদ্ভূত । এর অর্থ কোন বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস করা। ইসলামের পরিভাষায়:আকীদা অর্থ দৃঢ় ও মজবুত ঈমান,অকাট্য প্রমাণ ভিত্তিক খবরাখবর ও বিষয়াবলির প্রতি মনের অটল বিশ্বাস।

১। আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়,তার কোন শরীক নেই। অর্থাৎ আল্লাহর সত্তা যেমন এক,তার সত্তায় কেউ শরিক নেই,তেমনি ভাবে তার গুণাবলীতেও কেউ শরিক নেই এবং একমাত্র তারই ইবাদাত করতে হবে। ইবাদাতে তার সাথে কাউকে শরীক করা যাবে না।

২। আল্লাহর সদৃশ কোনো কিছু নেই। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালাকে কোন কিছুর সাথে তুলনা করা যাবে না। কারণ তিনি সবকিছু থেকে পবিত্র ও মুক্ত । (সুরাতুস শুরা, আয়াত-১১)

৩। কোন কিছুই তাকে অক্ষম করতে পারে না। তিনি যেহেতু পরিপূর্ণ ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, তাই কোন কিছুই তাকে অক্ষম করতে পারে না। (আল ফাতির-৪৪)

৪। তিনি ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ নেই। তিনি সমস্ত ইবাদতের উপযুক্ত। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয় । (সুরা আরফ, আয়াত-৫৯)

৫। তিনি অনাদি,অবিনশ্বর, তার কোন শুরু নেই, তিনি অনন্ত,তার কোন অন্ত নেই। অর্থাৎ তিনি সর্বপ্রথম ,তার পূর্বে কেউ ছিলনা এবং তিনি সর্বশেষ, তারপরে কেউ থাকবে না। (সুরা আল হাদিদ,আয়াত-৩)

৬। তার কোন ধ্বংস নেই। তিনি ক্ষয়প্রাপ্ত ও হবেন না। যা কিছু আছে সব ধ্বংস হবে । শুধু অবশিষ্ট থাকবে তিনি । (আর রহমান ২৭-২৮)

৭। তিনি যা চান তাই হয়, অন্য কিছু হয় না। অর্থাৎ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করেন। আবার যাকে ইচ্ছা তাকে পথভ্রষ্ট করেন। এতে অন্য কারো কর্তৃত্ব নেই। (সুরা আনআম- ১২৫)

৮। মানুষের কল্পনা ও ধারণা সমূহ তার ধারে কাছে পৌঁছাতে পারেনা। জ্ঞান ও বোধশক্তি তাকে উপলব্ধি ও আয়ত্ত করতে পারেনা। অর্থাৎ ধারণা ও কল্পনার মাধ্যমে আল্লাহকে উপলব্ধি করা এবং জ্ঞান বুদ্ধির মাধ্যমে তাকে পুরোপুরি পরিবেষ্টন করা সম্ভব নয়।

৯। তিনি চিরঞ্জীব, কখনো ও মারা যাবেন না। তিনি চির জাগ্রত, নিদ্রা জান না। অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব সবকিছুর ধারক। নিদ্রা তাকে স্পর্শ করতে পারেনা । (সুরা বাকারা আয়াত-২৫৫)

১০। তিনি সৃষ্টিকর্তা। সৃষ্টির প্রতি তার কোন প্রয়োজন ছাড়াই তিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি সবাইকে রিজিক দেন। অর্থাৎ তিনি মানুষ ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদাতের জন্য। তিনি কারো থেকে রিজিক চান না। বরং তিনি সবাইকে রিজিক দান করেন। (সুরা যরিয়াত আয়াত, ৫৬-৫৮)

১১। তিনি সবার প্রাণ হরণকারী ও পুনরুত্থানকারী। অর্থাৎ মৃত্যু একটি বিশেষণ। এর অস্তিত্ব রয়েছে। কারণ আল্লাহ বলেন আমি মৃত্যু ও জীবন তৈরি করেছি। সুতরাং যার কোন অস্তিত্ব নেই তাকে সৃষ্টি হিসেবে বিশেষিত করা হয় না । (সুরা মূলক,আয়াত ২)

১২। তিনি সৃষ্টির বহু পূর্ব থেকেই ছিলেন,আছেন এবং থাকবেন। সৃষ্টি জগত সৃষ্টি করার কারণে তার গুণের মধ্যে কোন সংযোজন ঘটেনি আর ঘটবে ও না ।

১৩। পৃথিবী সৃষ্টি করার পূর্বে ও তিনি খালেক ছিলেন এবং সবকিছু উদ্ভাবন করার পূর্বেও তিনি উদ্ভাবক ছিলেন। পৃথিবী সৃষ্টি করার পর তিনি খালেক হয়েছেন

বিষয়টি এমন নয়। বরং তিনি শুরু থেকেই খালেক ও উদ্ভাবক ছিলেন। (মুসলিম শরিফ-২৭১৩)

১৪। তিনি শুরু থেকেই রব হিসেবে ছিলেন এবং সৃষ্টি করার পূর্বে থেকে খালেক ছিলেন। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা এই কুল কায়নাত সৃষ্টি করার বহু পূর্ব থেকেই তিনি রব বা প্রতিপালক ও খালেক ছিলেন। এই কুল কায়নাত সৃষ্টির পর তিনি রব বা প্রতিপালক ও খালেক হয়েছেন এমন নয় ।

১৫। তিনি মৃতদের জীবন দানকারী। অর্থাৎ তিনি মৃতদের জীবন দানকারী আর এই গুন শুধু একমাত্র তারই।

১৬। তিনি সবকিছুর উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান। প্রত্যেক সৃষ্টি তার মুখাপেক্ষী, তিনি কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নয়। তিনি সবকিছু করতে পারেন মাখলুক ছাড়া । কিন্তু মাখলুক কিছুই করতে পারে না আল্লাহ ছাড়া। (সুরা বাকারা আয়াত-২৮৪)

১৭। তিনি স্বীয় জ্ঞানে সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ তিনি স্বজ্ঞানে এগুলো সৃষ্টি করেছেন । সৃষ্টি করার সময় এগুলোর জ্ঞান তার ছিল না, বিষয়টা এমন নয়। (সুরা মুলুক,আয়াত -১৪)

১৮। তিনি তাদের জন্য তাকদীর বা পরিমান নির্ধারণ করেছেন এবং সবকিছুর জন্য একটি সময় নির্ধারন করে দিয়েছেন । (সূরা ফুরকান,আয়াত-২)

১৯। তিনি সবকিছুর মৃত্যুর সময় নির্ধারিত করে দিয়েছেন।
(সুরা নাহল,আয়াত-৬১)

২০। সৃষ্টি জগত সৃষ্টির পূর্বে কোন কিছুই তার কাছে গোপন ছিল না এবং সৃষ্টি করার পর তারা কি করবে তাও তিনি জানতেন। অর্থাৎ যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে আর যা সৃষ্টি হয়নি তা সৃষ্টি হলে কেমন হতো তাও তিনি জানেন।

২১। তিনি তাদেরকে আনুগত্য করার আদেশ দিয়েছেন। এবং তার নাফরমানী করতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ মানুষ ও জ্বিন জাতিকে সৃষ্টি করেছে তার গোলামী করার জন্য। (সুরা যারিয়াত,আয়াত-৫৬)

২২। আল্লাহ অনুগ্রহ করে যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত দান করেন। আর যাকে ইচ্ছা ন্যায় বিচারের মাধ্যমে পথভ্রষ্ট করেন । হেদায়েত দান করা বা পথভ্রষ্ট করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর । অন্য কারো হেদায়েত করা বা পথভ্রষ্ট করার অধিকার নেই। (সূরা কাসাস,আয়াত-৫৬)

২৩। তিনি কারো প্রতিদ্বন্দ্বী এবং সমকক্ষ হওয়ার ঊর্ধ্বে। আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী করার মত কেউ নেই। তার সমকক্ষ ও নেই। কারণ তিনি সবার ঊর্ধ্বে তার সাথে কোন তুলনায় চলে না। (সুরা ইখলাছ)

২৪। তার ফায়সালার কোন প্রতিহতকারী কেউ নেই। তার হুকুমকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করার কেউ নেই। এবং তার নির্দেশকে পরাভূত করার কেউ নেই । অর্থাৎ কোন প্রতিহতকারী আল্লাহর ফয়সালা কে প্রতিরোধ করতে পারে না। এবং তার হুকুমকে পিছনে ফেলার কেউ নেই। আল্লাহর আদেশকে পরাভূত করার কেউ নেই । তিনি অদ্বিতীয় প্রতাপশালী বাদশা।

ফেরেস্তা সম্পর্কে আকিদা

ফেরেস্তা সম্পর্কে এই বিশ্বাস করতে হবে যে,তারা আল্লাহর সৃষ্ট নূরের তৈরি এক প্রকার মাখলুক। যারা পুরুষ ও নয় নারীও নয় ।

যারা খাওয়া,পান করা,লোভ লালসা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যারা আল্লাহর আদেশ পালনের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম করে না। আল্লাহ তাদের বিপুল শক্তি দিয়েছেন। তারা বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত। তাদের সংখ্যা অসংখ্য ও অগণিত। তাদের মধ্যে চারজন সর্ব প্রধান যথা-

(ক) জিব্রাইল=তিনি আল্লাহর ওহী ও আদেশ নবীদের নিকট পৌঁছে দেন।
(খ) মিকাইল=তিনি মেঘমালা হাকিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে ও বৃষ্টি বর্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত।
(গ) ইসরাফিল=তিনি সিঙ্গায় ফুৎকার দেয়ার কাজে নিয়োজিত।
(ঘ) আজরাইল=তিনি জীবের প্রাণ হরণ করার কাজে নিয়োজিত। প্রাণ হরণ করার জন্য, তার কাছে তার, আসতে হয় না। বরং গোটা দুনিয়া তার সামনে একটি প্লেটের মতো। যা তার সামনে অবস্থিত। যার আয়ু শেষ তার রুহ সেখান থেকে উঠিয়ে নেন।

নবী ও রাসুল সম্পর্কে আকীদা

নবী ও রাসুলের পরিচয় :

জ্বিন ও ইনসানের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন সে কিতাব বুঝানোর জন্য যাদেরকে প্রেরণ করেছেন তাদেরকে নবী ও রাসুল বলে।

নবি ও রাসুরের মধ্যে পার্থক্য

এই নবীদের মধ্যে যাদেরকে নতুন কিতাব ও শরীয়ত দেয়া হয়েছে তাদেরকে রাসুল বলেন।

আর যাদের কে নতুন কিতাব ও নতুন শরিয়ত দেয়া হয়নি, বরং পূর্বের নবীর কিতাব প্রচারের দায়িত্ব পেয়েছেন,তাদেরকে নবী বলে হয়।

নবী ও রাসুলের প্রতি বিশ্বাস রাখার অর্থ হলো-

১। তারা নিস্পাপ। তাদের দ্বারা কোন গুনাহ সংঘটিত হয় না।

২। তারা হলেন মানুষ,খোদার পুত্র নন। তারা হলেন আল্লাহর প্রতিনিধি ও নায়েব।

৩। তারা আল্লাহর বাণী হুবহু পৌঁছে দিয়েছেন।

৪। নবীদের ছিলছিলা আদম আলাইহিস সাল্লাম থেকে শুরু করে আমাদের নবীর উপর শেষ হয়েছে।

৫। আমাদের নবী সর্বশেষ নবী ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তারপরে আর কোন নবী আসবে না। যদি কেউ নবী হিসেবে দাবি করে তাহলে সে ভন্ড,প্রতারক ও মিথ্যাবাদী।
৬। নবীগণ কবরে জীবিত। আমাদের নবীও কবরে জীবিত । তার রওজায় গিয়ে কেউ সালাম দিলে তিনি শুনতে পান ও উত্তর দেন। আর দূর দেশ থেকে কেহ তার প্রতি দরুদ সালাম পাঠ করলে,নির্ধারিত ফেরেস্তারা নবীর নিকট পৌঁছে দেন।
৭। যত নবী এসেছেন তারা সবাই হক ও সত্য। তাদের সকলের প্রতি ঈমান রাখতে হবে। তবে আমাদের নবী আসার পর অন্য নবীদের শরীয়ত রহিত হয়ে গিয়েছে। এখন শুধু আমাদের নবীর শরিয়ত ও তার আনুগত্য চলবে।
৮। নবীদের সত্যতা প্রমান করার জন্য অনেক সময় যে অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে এগুলোকে মোজেজা বলে। এগুলোকে ও বিশ্বাস করতে হবে ।

আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে আকিদা

আল্লাহ তায়ালা মানুষ ও জ্বিন জাতির হেদায়েতের জন্য এবং দিক নির্দেশনার জন্য ,নবীদের মাধ্যমে তার বাণী সমূহ পৌঁছে দিয়ে থাকেন । এই বাণী ও আদেশ নিষেধের সমষ্টিকে কিতাব বলে।
আল্লাহ অনেক কিতাব পাঠিয়েছেন তার মধ্যে কিছু রয়েছে সহিফা (কয়েক পাতার) কিতাব।
এক বর্ণনা অনুযায়ী সর্বমোট কিতাব ১০৪ খানা। তার মধ্যে বড় হলো চার খানা। যথা –
(ক) তাওরাত -মূসা আলাইহিস সাল্লাম এর উপর নাযিল হয়।
(খ) যবূর- দাউদ আলাইহিস সাল্লামের উপর নাযিল হয়।
(গ) ইঞ্জিল- ঈসা আলাইহিস সাল্লাম এর উপর নাযিল হয় ।

(ঘ) কোরআন-যা আমাদের নবীর উপর নাযিল হয়েছে।
উল্লেখ্য যে আল্লাহর প্রেরিত ইঞ্জিল আজ দুনিয়ার কোথাও পাওয়া যায় না। বর্তমান যে ইঞ্জিল বা বাইবেল পাওয়া যায় তা মূলত ঈসা (আঃ) কে আকাশে উঠিয়ে নেয়ার পর কিছু মানুষ তা রচনা করেছে,নিজেদের মন মত তাতে পরিবর্তন ও সংযোজন করেছে। ফলে এটাকে আসমানি ইঞ্জিল বলে মেনে নেয়া যায় না।
কিতাব সম্পর্কে বিশ্বাস রাখার অর্থ হলো-
১। কিতাব আল্লাহর বাণী মানব রচিত নয়।
২। তিনি যেমন অবিনশ্বর, তার বাণীও তেমন অবিনশ্বর। আর কোরআন অবিনশ্বর,নশ্বর বা সৃষ্ট নয়।
৩। কোরআন শরীফ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ কিতাব। এরপর আর কোন কিতাব নাযিল হবে না। কিয়ামত পর্যন্ত শুধু কুরআনের বিধান চলবে। কোরআন নাযিল হওয়ার পর অন্য সব আসমানী কিতাবের বিধান রহিত হয়েছে।
৪। আসমানি কিতাব সমূহের মধ্যে কোরআন শরিফ হলো সর্বশ্রেষ্ঠ।
৫। কোরআন শরীফ হেফাজতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ নিয়েছেন। কেয়ামত পর্যন্ত কেউ এতে পরিবর্তন করতে পারবে না।
কোরআন শরীফ সর্বদা অবিকৃত বলে বিশ্বাস করতে হবে।

আখেরাত সম্পর্কে আকিদা

আখেরাত বলতে, মৃত্যুর পর থেকে শুরু করে কবর, হাশর, নাসর, পুলসিরাত, জান্নাত, ও জাহান্নাম আছে এ বিষয়গুলো সত্য বলে বিশ্বাস করা।
আখেরাতের নিম্নে বিষয়গুলোর উপর ঈমান আনতে হবে।যথা-

১। কবরের ছুওয়াল জওয়াব সত্য। অর্থাৎ কবরে প্রত্যেক মানুষের পরীক্ষা নেওয়া হবে। পরীক্ষা নিবেন দুজন সম্মানিত ফেরেস্তা। একজন হলেন মুনকার আর অপর জন হলো নকীর। কবরে তিনটি প্রশ্ন করা হবে।যথা-

(ক) তোমার রব কে?

(খ) তোমার দ্বীন কি?

(গ) তোমার রাসুল কে?

সঠিক উত্তর দিতে পারলে জান্নাতে যাবে। আর উত্তর না দিতে পারলে জাহান্নামে যাবে।

২। কবরের আযাব সত্য। অর্থাৎ কবর বলতে বোঝায় মৃত্যুর পর থেকে হাশরের মাঠে উঠার আগ পর্যন্ত সময়কে। কবরের শাস্তি হয় মূলত রুহের উপর এবং সাথে সাথে দেহ ও উপলব্ধি করতে পারে, দেহ যেখানে যেভাবেই থাকুক না কেন। চাই তা জ্বলে পুরে ছাই হোক,বা পচে গলে মাটি হোক, বা পানিতে নষ্ট হোক, আল্লাহ তা পুনরায় গঠন করতে সক্ষম।

৩। পুনরুত্থান ও হাশরের ময়দানের অনুষ্ঠান সত্য। অর্থাৎ কিয়ামতের সময় সিঙ্গায় ফু দেয়া হলে সবকিছু তছনছ হয়ে যাবে। আবার আল্লাহর হুকুমে ফু দেয়া হলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত জ্বিন,ইনসান ও প্রাণী মারা গিয়েছে তারা সবাই জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানে একত্র হবে ।

৪। আল্লাহর বিচার ও হিসাব নিকাশ সত্য। পুনুরায় জীবিত হওয়ার পর আল্লাহর বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। তার সামনে হিসাব দিতে হবে।

৫। নেকি ও বদির যে ওজন করা হবে তা সত্য। হিসাব নিকাশের জন্য যে মিজান বা দাড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে তা সত্য। তার দ্বারা নেকী ও বদির পরিমাপ করা হবে।

৬। কিয়ামতের ময়দানে আমল নামার প্রাপ্তি সত্য। কিয়ামতের ময়দানে আমল নামা উড়িয়ে দেওয়া হবে এবং প্রত্যেকের আমলনামা তার হাতে গিয়ে পড়বে। নেককার হলে ডান হাতে আর বদকার হলে বাম হাতে।

৭। হাউজে কাওসার সত্য। যারা পরিপূর্ণভাবে সুন্নতের অনুসরণ করবে,রাসুল (সঃ) তাদের হাউজে কাওসার থেকে পানি পান করাবেন।

৮। পুলসিরাত সত্য। হাশরের ময়দানের চতুর দিকে জাহান্নাম দ্বারা পরিবেষ্টন করা থাকবে। এই জাহান্নামের উপর একটি পুল স্থাপন করা থাকবে। যা চুলের চেয়েও চিকন, হীরার চেয়েও ধারালো। সকলকে এই পুল পার হতে হবে।

৯। শাফায়াত সত্য। পরকালে রসূলের সুপারিশ,হাফেজদের,আলেমদের, বিভিন্ন পর্যায়ের সুপারিশ করার ক্ষমতা দেয়া হবে। এবং তারা সুপারিশ করবে এটা সত্য।

১০। জান্নাত বা বেহেস্ত সত্য। আল্লাহ তার নেক বান্দাদের জন্য যে নাজ নেয়ামত তৈরি করে রেখেছেন, যা কোন চোখ দেখেনি,কোন কান শোনেনি,কোন অন্তর যার কল্পনা করতে পারে নি। এই সব মহান নেয়ামতের স্থানসমূহ হলো জান্নাত।

জান্নাত ৮টি। যথা- (ক) জান্নাতুল ফেরদাউস (খ) জান্নাতুল মাওয়া (গ) জান্নাতুল আদন (ঘ) দারুস সালাম (ঙ) জান্নাতুন নাঈম (চ) দারুল খুলুদ (ছ) দারুল কারার (জ) দারুল মাকাম।

১১। জাহান্নাম সত্য। পরকালে আল্লাহ পাপিদের কে শাস্তি দেওয়ার জন্য যে আগুন,সাপ,বিচ্ছু ইত্যাদি উপকরন দ্বারা যে জায়গা প্রস্তুত করে রেখেছেন তাকে জাহান্নাম বলে। জাহান্নামের ৭টি স্তর আছে।যথা- (ক) জাহান্নাম (খ) লাজা (গ) হাবিয়া (ঘ) হুতমা (ঙ) সায়ীর (চ) সাকার (ছ) জাহীম

তাকদীর সম্পর্কে আকিদা

তাকদীর বলতে কি বুঝায়?

তাকদির অর্থ:পরিকল্পনা বা নকশা। আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করার পূর্বে সৃষ্ট সৃষ্টি জগতের একটি নকশা তৈরি করে রেখেছেন। এবং সবকিছুর পরিকল্পনা ও লিখে রেখেছেন। এই নকশা ও পরিকল্পনাকেই বলা হয় তাকদীর। এই নকশা ও পরিকল্পনা অনুসারেই সবকিছু সংঘটিত হয় ও হবে।

তাকদীর সম্বন্ধে বিশ্বাস রাখার অর্থ হল:

১। সবকিছু সৃষ্টি করার পূর্ব আল্লাহ তা লিখে রেখেছেন।

২। সবকিছু ঘটার পূর্বে সে সম্বন্ধে তিনি অবগত থাকেন। এবং তার ইচ্ছা অনুসারেই সবকিছু সংঘটিত হয়।

৩। তিনি ভালো ও মন্দ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। তবে ভালো বিষয়গুলো তার দিকে ফিরানো হয় আর মন্দ বিষয়গুলো তার দিকে ফেরানো যাবে না। বরং বান্দার দিকে ফেরাতে হবে ,কারণ মন্দ সৃষ্টি করা মন্দ নয়,বরং মন্দ উপার্জন করা হলো মন্দ।

৪। আল্লাহ কলম দ্বারা লাওহে মাহফুজে তাকদীরের সবকিছু লিখে রেখেছেন। তাই লওহ কলম ও লওহে মাহফুজে যা কিছু লিখে রাখা হয়েছে সবকিছুতে বিশ্বাস রাখা তাকদীরের অন্তরভূক্ত।

৫। আল্লাহর যত আদেশ ও নিষেধ আছে সব মানুষের সাধ্যের ভিতরে,বাহিরে নয়। কারণ কোন অসাধ্য বিষয় আল্লাহ মানুষের উপর চাপিয়ে দেন না ।

৬। আল্লাহর উপর কোন কিছু ওয়াজিব নয়। তিনি কাউকে কিছু দিতে বাধ্য নয়। তার উপর কারো রাজত্ব চলে না। তিনি যা কিছু দেন সব তার রহমত ও মেহেরবানী মাত্র।

মেরাজ সম্পর্কে আকিদা

আমাদের নবী মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আল্লাহ এক রাত্রে জাগ্রত অবস্থায় মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত নিয়ে যান। (এটাকে ইসরা বলে)

আর সেখান থেকে তিনি আসমানের উপর এবং সেখান থেকে আরো উপরে যতদূর আল্লাহর ইচ্ছা নিয়ে যান। তিনি সেখানে গিয়ে জান্নাত দেখেন জাহান্নাম দেখেন এবং আল্লাহর দিদার লাভে ধন্য হন। আল্লাহর সাথে কথা বলে। আল্লাহ তাঁকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ হাদিয়া দেন। সে রাতেই তিনি দুনিয়াতে চলে আসেন একেই মেরাজ বলে।

আরশ কুরসী সম্পর্কে আকিদা

আরশ অর্থ চেয়ার বা আসন। আল্লাহ যেমন তার আরশ কুরছি ও তেমন শানের হয়ে থাকবে। তার আরশ কুরছি সপ্ত আসমানে অবস্থিত। আরশ কুরসি এত বড় যা আসমান ও জমিনকে পরিবেষ্টন করে আছে। তিনি কোন স্থান-কাল ও পাত্রের সাথে সীমাবদ্ধ নন। তিনি মানুষের মতো ওঠা বসা করা থেকে মুক্ত। তিনি কেমন কিভাবে কি করেন একমাত্র তিনিই ভালো জানেন। আমাদের কে এই বিশ্বাস রাখতে হবে।

আল্লাহর দিদার সম্পর্কে আকিদা

আল্লাহর দিদার বা আল্লাহকে দেখা সম্পর্কে ইসলামের আকিদা হল দুনিয়া থেকে জাগ্রত অবস্থায় এই চর্ম চক্ষুর দ্বারা আল্লাহকে দেখা অসম্ভব। কেহ দেখতে পারে নি,আর পারবেও না। বেহেস্তবাসীরা বেহেস্তে গিয়ে আল্লাহর দিদার লাভ করবেন। এটা বেহেস্তের সবচেয়ে বড় নেয়ামত।

কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে আকিদা

হাদিসে কিয়ামতের ছোট-বড় অনেক আলামত বর্ণিত হয়েছে। যেগুলো দেখে মনে হয় কেয়ামত একদম সন্নিকটে। আর এই আলামত গুলো সত্য তা মনে প্রানে বিশ্বাস করা।

বোঝার সুবিধার জন্য কেয়ামতের কিছু আলামত নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

কিয়ামতের ছোট আলামত

১। লোকেরা ওয়াকফকৃত সম্পদকে নিজের মালের মতো মনে করে ভোগ করতে থাকবে।

২। যাকাত দেওয়াকে দন্ড স্বরূপ মনে করবে।

৩। আমানতের মালে খিয়ানত করবে।

৪। পুরুষ স্ত্রীর তাবেদারী করবে।

৫। মায়ের নাফরমানী করবে।

৬। খারাপ ও বদকার লোকেরা রাজত্ব করবে।

৭। অযোগ্য লোকেরা বিভিন্ন কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে।

৮। নাচ-গান ও বাদ্য-বাজনার প্রচলন বেড়ে যাবে।

কেয়ামতের বড় আলামত

১। ইমাম মাহদীর আবির্ভাব ঘটবে।

২। দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে।

৩। আসমান থেকে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আগমন ঘটবে।

৪। দাব্বাতুল আরদ এর বহিঃপ্রকাশ ঘটবে।

৫। ইয়াজুজ ও মাজুজ এর আবির্ভাব ঘটবে।

৬। পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয় হবে।
ইমাম মাহদীর আগমনের পর এগুলো ঘটবে ।

ইমাম মাহদী সম্পর্কে আকিদা

কিয়ামতের ছোট ছোট আলামত যখন প্রকাশ হবে। তখন গোটা দুনিয়ায় কাফেরদের রাজত্ব বেড়ে যাবে। কিছু নেককার বান্দা মক্কায় বাইতুল্লাহ শরীফে তাওয়াফ করা অবস্থায় হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইব্রহিমের মাঝখানে তাকে দেখে চিনতে পারবে। এবং নেককার লোকেরা তার হাতে বায়াত করে তাকে খলিফা বানাবেন। তখন তার বয়স হবে ৪০ বছর হবে। তার নাম হবে মোহাম্মদ। তার বাবার নাম হবে আব্দুল্লাহ। তিনি ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার বংশধর। তিনি জন্মগ্রহণ করবেন মদিনায়। তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে হিজরত করবেন। তার দৈহিক গঠন ও আচার-আচরণ স্বভাব চরিত্র হবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর মত। তিনি নবীও নন। তার প্রতি অহীও আসবেনা। তিনি মুসলমানদের খলিফা হবেন। তিনি কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবেন এবং তাদের থেকে শাম দেশ ও ইসতাম্বুল জয় করবেন। তার আমলে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। অবশেষে ইসা (আঃ) আসবেন আর তিনি ইন্তেকাল করবেন।

দাজ্জাল সম্পর্কে আকিদা

দাজ্জাল অর্থ ধোঁকাবাজ,প্রতারক। আল্লাহ শেষ জামানার লোকদের ঈমান পরীক্ষা করার জন্য প্রচুর ক্ষমতা দিয়ে প্রেরণ করবেন দাজ্জালকে। তার একচোখ হবে কানা আর অপর চোখ হবে ট্যারা। চুলগুলো হবে কোকড়ানো ও লাল বর্ণের। ইরাক ও শাম দেশের মাঝখানে তার আগমন ঘটবে। সে হবে ইহুদি বংশের লোক। সে ইস্পাহানে যাবে সেখানে ৭০ হাজার ইহুদি তার দলে যোগ

দিবে। সে ৪০ দিন রাজত্ব করবে। মক্কা-মদিনা ও বায়তুল মুকাদ্দাস ছাড়া সব জায়গাতে যেতে পারবে। কিন্তু এই জায়গা গুলোতে যেতে পারবে না। তার এক হাতে থাকবে জান্নাত,আর অপর হাতে থাকবে জাহান্নাম। মূলত তার জান্নাত হবে জাহান্নাম,আর জাহান্নাম হবে জান্নাত। সে বৃষ্টি বর্ষণ করতে পারবে। সে মৃতকে জীবিত করতে পারবে। সর্বশেষ হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তাকে হত্যা করবে।

দাজ্জালের ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য আমরা সূরা কাহাফ এর প্রথম ১০ আয়াত পড়বো। এই দোয়া পড়ব। দোয়াটি হলো- আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন ফিতনাতিল মাছিহিদ দাজ্জাল।

ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে আকিদা

দাজ্জাল ও তার বাহিনী মুসলমানদের অবরোধ করবে বাইতুল মুকাদ্দাসের চতুর দিক থেকে। ইতিমধ্যে একদিন ফজরের নামাজের একামত হওয়ার পর হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ফেরেশতাদের উপর ভর করে বাইতুল মুকাদ্দাসের পূর্ব দিকের মিনারের নিকট তিনি অবতরণ করবেন। আর ফজরের নামাজের ইমামতি করবেন ইমাম মাহদী। নামাজের পর হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ছোট্ট একটা বর্শা নিয়ে ধাওয়া করবেন। বাবেলুদ নামক স্থানে গিয়ে বর্শার আঘাতে তাকে হত্যা করবেন। মুসলমানদের বিশ্বাস হলো আল্লাহ ঈসা আলাইহিস সালামকে জীবিত অবস্থায় আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন।

ইহুদীরা তাকে হত্যা করতে পারেনি। শুলে ও চরাতে পারেনি। তিনি আকাশে জীবিত আছেন। তিনি দুনিয়াতে এসে ৪০ বছর রাজত্ব করবেন।

তিনি নবী হিসেবে আসবেন না বরং আমাদের নবীর উম্মত হয়ে আসবেন এবং রসুল (স:) এর শরীয়ত অনুযায়ী আমল করবেন।

ইয়াজুজ ও মাজুজ সম্পর্কে আকিদা

দাজ্জালের ফেতনা শেষ হওয়ার পর ইয়াজুজ,মাজুজ এর ফেতনা শুরু হবে। তাদের সংখ্যা অনেক বেশি। তারা দ্রুত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। এবং হত্যা ও লুটতারাজ চালাতে থাকবে। তখন ঈসা (আ:) ও তার সঙ্গীরা পর্বতে আশ্রয় নিবে। মুসলমানদের কষ্ট দূর করার জন্য তিনি দোয়া করবেন।ফলে আল্লাহ মহামারী আকারে একটা রোগ দিবেন যেই রোগের কারণে ইয়াজুজ মাজুজের দল মরে শেষ হয়ে যাবে। তাদের মরা দেহ থেকে যখন দুর্গন্ধ বের হবে তখন আল্লাহ এক ধরনের পাখি পাঠাবেন। যাদের ঘাড় উটের ঘাড়ের মত মৃত দেহগুলো উড়িয়ে নিয়ে সাগরে ফেলে দিবেন। তারপর আল্লাহ বৃষ্টি দিবেন ফলে পুরো জমিন পরিষ্কার হয়ে যাবে।

আকাশে এক ধরনের ধোঁয়া

হযরত ঈসা (আ:) ইন্তেকালের পর কিছু নেককার লোক ইনসাফের সাথে রাজত্ব পরিচালনা করবে। তারপর ক্রমান্বয়ে মানুষ ইসলামকে ভুলে যাবে। একসময় আকাশ থেকে এক ধরনের ধোঁয়া বের হবে। যার ফলে মুসলমানদের সর্দির মত ভাব হবে। আর কাফেররা বেহুশ হয়ে পড়ে থাকবে। ৪০ দিন পর ধোঁয়া দূর হবে।

পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয় সম্পর্কে আকিদা

ধোঁয়া চলে যাওয়ার কিছুদিন পর একদিন হঠাৎ একরাত তিন রাতের সমান হবে। মানুষ ঘুমাতে ঘুমাতে বিরক্ত হয়ে যাবে। গবাদি পশু বাহিরে যাওয়ার জন্য চিৎকার শুরু করবে। সূর্য সামান্য আলো নিয়ে পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। তখন থেকে আর কারো তওবা কবুল করা হবে না। সূর্য মধ্য আকাশ পর্যন্ত এসে

আল্লাহর আদেশে আবার পশ্চিমে গিয়েই অস্ত যাবে। আবার আগের মত যথারীতি সূর্য পূর্ব আকাশে উঠবে পশ্চিমে গিয়ে অস্ত যাবে।

দাব্বাতুল আরদ সম্পর্কে আকিদা

পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠার কিছুদিন পর মক্কার সাফা পাহাড় ফেটে এক জন্তু বের হবে, আর এই জন্তুকেই দাব্বাতুল আরদ বলে। এই জন্তু মানুষের সাথে কথা বলবে। মুমিনের চেহারাতে তারা একটি রেখা টেনে দিবে। ফলে তাদের চেহারা উজ্জ্বল হবে। তারা প্রত্যেক মুমিন ও কাফেরকে চিনতে পারবে। আর এই জন্তুর আকার-আকৃতি কেমন হবে তার নির্ভরযোগ্য কোন ইতিহাস নেই। বিধায় তা উল্লেখ করা হয়নি। এটা কিয়ামতের সর্বশেষ আলামতের মধ্যে অন্যতম।

কিয়ামতের পূর্বক্ষণে দুনিয়ার অবস্থা

দাব্বাতুল আরদ গায়েব হওয়ার পর দক্ষিন দিক হতে একটি আরামদায়ক বাতাস প্রবাহিত হবে, মুমিনদের বগলের নিচে কিছু রোগ দেখা দিবে সমস্ত মুমিনরা মারা যাবে। অবশেষে দুনিয়াতে শুধু কাফের থাকবে এবং তাদের উপর কেয়ামত সংঘটিত হবে।

জ্বিন সম্পর্কে আকিদা

তারা আগুনের তৈরি আল্লাহর মাখলুক। তারা আমাদের দৃষ্টির আড়ালে রয়েছে। তাদের মধ্যে ভালো ও মন্দ উভয় শ্রেণী রয়েছে। তাদের সন্তানাদিও হয়। তাদের সবার লিডার হলো ইবলিস। জিন মানুষের উপর আছর ফেলতে পারে। তাদেরও আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে এবং হিসাব দিতে হবে।

ইসালে ছওয়াব সম্পর্কে আকিদা

ইসালে ছওয়াব অর্থ হলো মৃত মুসলমানদের জন্য আমরা যে তাসবিহ,তাহলিল,দান-সদকা,তেলাওয়াত,নফল নামাজ, ইত্যাদি শারীরিকি ও আর্থিক ইবাদাতের মাধ্যমে আমরা যে সওয়াব পাঠাই তাকে ঈসালে ছওয়াব বলে। তবে আমাদের সমাজে ইসালে সওয়াবের যে প্রচলিত নিয়ম আছে এটা থেকে আমাদের বিরত থাকা উচিত ।

দোয়ার মধ্যে অসিলা তালাশ সম্পর্কে আকিদা

দোয়া কবুল হওয়ার জন্য নবীদের বা কোন জীবিত নেককার বুযুর্গের অসিলা দিয়ে বা কোন নেক কাজের অসিলা দিয়ে দোয়া করা জায়েজ ও মুস্তাহাব।

কারামত,কাশফ,এলহাম সম্পর্কে আকিদা

বুযুর্গ ও অলি আউলিয়াদের দ্বারা আল্লাহ যে অসাধারন কাজ দেখিয়ে থাকেন তাকে কারামত বলে।

আর জাগ্রত বা নিদ্রা অবস্থায় তারা যে ভেদের কথা জানতে পারেন বা চোখের অগচরের জিনিসকে দিলের চোখ দিয়ে দেখতে পারেন এটাকে বলে কাশফ ও এলহাম।

আর বুযুর্গ বা অলি বলা হয় আল্লাহর প্রিয় বান্দাকে। আর শরীয়তের বরখেলাপ করে আল্লাহর প্রিয় তথা বুযুর্গ বা অলি হওয়া যায়না। আর শরিয়তের বরখেলাপ এর অর্থ হল, যে নামাজ পড়ে না,রোজা রাখে না,মাদক দ্রব্য বা শরাব পান করে।

পীর বুজুর্গ সম্পর্কে আকিদা

পীর বুযুর্গ ব্যক্তির ব্যাপারে এই বিশ্বাস রাখা শিরক,যে তিনি সব সময় আমাদের অবস্থা জানেন। কোন পীর বা বুযুর্গকে দূর দেশ থেকে ডাকা হলে তিনি জানতে পেরেছেন মনে করা শিরক। কোন পীর বা বুযুর্গ ব্যক্তি গায়েব জানে না। তবে

তাদের এলহাম হতে পারে এটা অন্য কথা। কোন পীর বা বুজুর্গ যেই হোক তারা নবী বা সাহাবীদের থেকে সম্মানের দিক দিয়ে বড় হতে পারে না ।

মাজার সম্পর্কে আকিদা

মাজার শব্দের অর্থ যিয়ারতের স্থান। সাধারণ ভাবে বুযুর্গদের কবর যেখানে যিয়ারত করা হয়,তাকে মাজার বলে। সাধারণতঃ কবর জিয়ারতের দ্বারা বেশ কিছু ফায়দা হয়। যেমন মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়,কলব নরম হয়,আখেরাতের চিন্তা বৃদ্ধি পায় ইত্যাদি। কিছু সাধারন মানুষ মাজার যিয়ারত সম্পর্কে এমন কিছু গলদ আকিদা রাখে যা অনেকটাই শিরক পর্যায়ে।

মাজার সম্পর্কে ভ্রান্ত আকিদা সমূহ

১। মাজারে গেলে বিপদ আপদ দূর হয়।

২। মাজারে গেলে আয় উন্নতিতে বরকত হয়।

৩। মাজারে গেলে ব্যবসা-বাণিজ্য বেশি হয়।

৪। মাজারে টাকা পয়সা দিলে ফায়দা হয়।

৫। মাজারে ফুল দেওয়া ,মোমবাতি দেওয়া আগরবাতি দেওয়াকে সওয়াবের কাজ মনে করা।

৬। মাজারে মান্নত করলে উদ্দেশ্য পূরণ হয়।

৭। মাজারে সন্তান চাইলে সন্তান লাভ হয়।

৮। যে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে মাজারে গেলে মকসুদ পুরা হয়। এই সমস্ত ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে আল্লাহ আমাদের সকলকে হেফাজত করুন। শুধু তার দিকেই ফেরার তাওফিক দান করুন। আমিন

আসবাব বা বস্তুর ক্ষমতা সম্পর্কে আকীদা

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা হলোঃ-আসবাব বা বস্তুর নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। কোন আসবাব বা বস্তুর ক্ষমতা আছে এমন মনে করা শিরক। বস্তু থেকে যে ক্ষমতা প্রকাশ পায় তা মূলত আল্লাহ প্রদত্ত,তার নিজস্ব ক্ষমতা নয়।

রোগ সংক্রমণ সম্পর্কে আকিদা

এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ আকিদা হল ইসলামে ছোঁয়াচে রোগ বলতে কিছু নেই। কারন কোনো রোগের মধ্যে সংক্রমণ হওয়ার কোন নিজস্ব ক্ষমতা নেই। তাই তথাকথিত সংক্রমণ ব্যধিতে আক্রান্ত লোকের কাছে যাওয়ার পরেও আক্রান্ত হয় না। আবার অনেকে না গিয়েও আক্রান্ত হয়। যদি আল্লাহর ফায়সালা থাকে যে সে এই ব্যধিতে আক্রান্ত হবে,তাহলে সে আক্রান্ত হবেই হবে। চাই সে এ রোগের রোগীর কাছে যাক বা না যাক। তবে ইসলামে এসব প্রচলিত সংক্রমগে আক্রান্ত রোগীর কাছে যেতে নিষেধ করেছে কয়েকটি কারণে।
(ক) দুর্বল ঈমানের অধিকারী হওয়ার কারণে। কারন হতে পারে এই রোগে সে আক্রান্ত হবে,এটা আল্লাহ তায়ালার ফয়সালা ছিল। কিন্তু সে মনে করে এর কাছে আসার কারণে তার ও এই রোগ হয়েছে। এতে করে তার ঈমান আমল সব বরবাদ হয়ে যাবে।
(খ) অনুরুপ ভাবে সুস্থ ব্যক্তিকেও অন্য এলাকায় যেতে নিষেধ করা হয়েছে,যাতে করে অন্য কারো আকীদা নষ্ট না হয়। আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক বুঝার তৌফিক দান করুন।

সাহাবীদের সম্পর্কে আকিদা

সকল সাহাবী সত্যবাদী ইনসাফগার মুত্তাকী ও পরহেজগার ছিল। ইসলাম ও উম্মতের স্বার্থকে নিজেদের স্বার্থের ওপরে স্থান দিয়েছেন। তারা সকলে সমালোচনার ঊর্ধ্বে। তাদের সমালোচনা করা যাবে না। তাদের প্রতি ভক্তি,শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে। সাহাবীদের মর্যাদা সমস্ত অলি আউলিয়াদের ঊর্ধ্বে। সকল সাহাবীদের প্রতি আল্লাহ রাজি খুশি ছিলেন। সাহাবীদের মধ্যে চারজন সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবী।
প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ)
দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ)
তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান গনি (রাঃ)
চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রাঃ)

রসুলের আওলাদগন সম্পর্কে আকিদা

রসুল (সাঃ) এর আওলাদ গণের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মর্যাদা তার কন্যা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার। আর বিবিদের মধ্যে হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা ও আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা এর মর্যাদা বেশি।

রাশি সম্পর্কে আকিদা

রাশি বলা হয় সৌরজগতের কতগুলো গ্রহ নক্ষত্রের প্রতীককে। এগুলো মূলত কল্পিত। এরূপ বারটি রাশি কল্পনা করা হয়।যথা-

১। বৃষ রাশি
২। মিথুন রাশি
৩। কর্কট রাশি
৪। কন্যা রাশি
৫। তুলা রাশি
৬। বৃশ্চিক রাশি
৭। ধনু রাশি
৮। মকর রাশি
৯। কুম্ভ রাশি
১০। মীন রাশি
১১। সিংহ রাশি
১২। মেষ রাশি

এগুলো কে বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্রের প্রতীক সাব্যস্ত করা হয়েছে। ইসলামি আকিদা অনুযায়ী গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে কোন প্রভাব বা ক্ষমতা নেই। সুতরাং ভাগ্য তথা শুভ অশুভগ্রহ নক্ষত্রের প্রভাবে ঘটে এই আকিদা বা বিশ্বাস রাখা শিরক। মুলত সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতার আধার একমাত্র আল্লাহর। তিনি চাইলে ভালো ও মন্দ যা ইচ্ছা করতে পারেন এতে দ্বিতীয় কারো কোন অধিকার নেই।

হস্তরেখা সম্পর্কে আকিদা

হস্তরেখা বিচারবিদ্যার মাধ্যমে গণকগণ হাতের রেখা দেখে ভাগ্যের বিষয় ও যে ভবিষৎ বাণী বলে তা বিশ্বাস করা যাবে না। কারণ ইসলামে এরূপ বিষয়ে বিশ্বাস রাখাকে কুফরি সাব্যস্ত করা হয়েছে।

রত্ন পাথর সম্পর্কে আকিদা

প্রিয় পাঠক,মনি,মুক্তা,হীরা,চুনি,পান্না,আকিক প্রভূতি পাথর ও রত্ন মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলতে পারে,মানুষের ভাগ্যে পরিবর্তন ঘটাতে পারে এমন আকিদা বিশ্বাস রাখা মুশরিকদের কাজ,মুসলমানদের কাজ নয়। বিধায় এগুলো বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকা উচিত। আল্লাহ আমাদের সেই তৌফিক দান করুন।

তাবিজ ও ঝাড়ফুক সম্পর্কে আকিদা

তাবিজ ঝাড়ফুকে কাজ হওয়াটা নিশ্চিত নয়-হলে হতেও পারে হতে পারে আবার নাও হতে পারে। সুতরাং তাবিজ ও ঝাড়ফুঁকে কাজ হলে ও সেটা তাবিজ বা ঝাড়ফুকের নিজস্ব ক্ষমতায় নয় বরং আল্লাহর ইচ্ছাতেই সবকিছু হয় এ বিশ্বাস রাখতে হবে।

যেমন রোগীর জন্য দোয়া করা হলে রোগী ভালো হওয়া বা না হওয়া নিশ্চিত নয়। ভালো হলে হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে রোগ ভালো করে দেন। এই সবকিছু মূলত আল্লাহর ইচ্ছা। দ্বিতীয় কারো কোনো ক্ষমতা নেই।

তাবিজ ও ঝাড়ফুক জায়েজ হওয়ার শর্ত

১। তাবিজ ও ঝাড়ফুক কোরআন হাদিসের বাক্যবলি দ্বারা বৈধ উদ্দেশ্যে করতে হবে। অবৈধ উদ্দেশ্যে করা যাবে না।
২। যেসব বাক্য বা শব্দ বা নকশার অর্থ জানা যায় না। তার দ্বারা তাবিজ ও ঝাড়ফুঁক করা বৈধ নয়।
৩। এই তাবিজকে বা ঝাড়ফুঁককে মুয়াচ্ছেরে হাকিকি বা প্রকৃত মুক্তিদাতা বা আরোগ্য দানকারী মনে করা যাবে না। বরং প্রকৃতপক্ষে মুক্তিদাতা ও আরোগ্য দানকারী হলেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা এ বিশ্বাস রাখতে হবে।
৪। তাবিজ বা ঝাড়ফুকের জন্য নির্দিষ্ট কোন দিন,তারিখ,সময় বা স্থান নেই বা কারো কাছ থেকে এজাজত নিতে হবে বিষয়টা এমন নয়।(ফতুয়ায়ে শামী ৬নং খন্ড)

নজর ও বাতাস সম্পর্কে আকিদা

হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী নজর লাগার বিষয় সত্য। জান ও মালের প্রতি বদনজর লেগে তার ক্ষতি হতে পারে। আপন জনদের প্রতিও আপন জনের বদনজর লাগতে পারে।

আর বাতাস লাগার দ্বারা যদি উদ্দেশ্য হয় এই- যে জ্বিন ভুতের বাতাস অর্থাৎ তাদের খারাপ আছর লাগা তাহলে এটাও সত্য। কারণ জ্বিন জাতি মানুষের উপর আছর করতে সক্ষম।

বদনজর থেকে বাঁচার কালো সুতা বাধা বা কালি দিয়ে টিপ দেয়া ভিত্তিহীন ও কুসংস্কার। এটা থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে।

বদনজর থেকে বাঁচার উপায় সমূহ

কারো উপর কারো বদনজর লাগলে,যার নজর লাগার সন্দেহ হয় ঐ ব্যক্তির মুখ,হাত ও শরীরের নিচের অঙ্গগুলো ধুয়ে সেই পানি যাকে বদ নজর লাগবে তার উপরে ঢেলে দিবে ইনশাআল্লাহ এতে করে সে ভালো হয়ে যাবে। আর জিনের আছর থেকে বাঁচার জন্য আমরা তিন কুল ও আয়াতুল কুরসির আমল করতে পারি। তিন কুল হল সূরা এখলাছ,সূরা ফালাক,আর সূরা নাস।

সুলক্ষণ ও কুলক্ষণ সম্পর্কে আকিদা

ইসলামী আকিদা মতে কোন বস্তু বা অবস্থা থেকে সুলক্ষণ বা কুলক্ষণ গ্রহণ করা জায়েজ নেই। কারণ ইসলামে কোন সুলক্ষণ বা কুলক্ষণ বলতে কিছু নেই।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত সম্পর্কে আকিদা

হাদিসে রাসুল (সা:) বলেন আমার উম্মতের মধ্যে ৭৩ দল হবে। একটি দল ব্যতীত সব দল জাহান্নামে যাবে। আর একটি দল জান্নাতে যাবে। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন ঐ মুক্তিপ্রাপ্ত দল কারা? রাসুল (সা:) বলেন তারা হল- আমি ও আমার সাহাবারা যে মত ও পথের উপর আছি তার অনুসারীগণ। এখানে মুক্তিপ্রাপ্ত দল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত।

দ্বীনের চার বুনিয়াদ সম্পর্কে আকিদা

দ্বীনের মূল বুনিয়াদ তথা যে সমস্ত বিষয়ের উপর শরিয়তের মূল ভিত্তি তা হল ৪টি। যথা:

(ক) কোরআন (খ) সুন্নাহ (গ) ইজমা (ঘ) কিয়াস
এই চারটি দ্বারা যা প্রমাণিত নয় তা দিনের অন্তর্ভুক্ত নয় । এই বিশ্বাস আমাদের রাখতে হবে । এই চারটির কোনটিকে অস্বীকার করা যাবে না। যদি কেহ কোন একটিকে অস্বীকার করে তাহলে তার ইমান নষ্ট হতে পারে ।

তাকলীদ ও মাযহাব সম্পর্কে আকিদা

প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য ফরজ হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরন করা । আর কোরআন ও হাদিসের অনুসরণের মাধ্যমেই এই ফরজ আদায় হবে। অর্থাৎ কোরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করাই হলো আল্লাহ ও তার রসুলের অনুসরন করা। যারা কোরআন ও হাদিসের ভাষা বোঝে না আরবি হওয়ার কারণে এবং কোরআন ও হাদিস থেকে মাসলা-মাসাইল বিধি-বিধান বাহির করতে পারেন না। কারণ এই কাজ করা সাধারণ মানুষদের জন্য সম্ভবও নয়। বিধায় সাধারণ মানুষদের জন্য কোন বিজ্ঞ আলেমের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। আর তিনি কোরআন হাদিস থেকে ইজতেহাদ করে যেসব মাসআলা -মাসায়েল ও বিধি বিধান যেভাবে বলেন সে ভাবে তার অনুসরণ করাকেই বলা হয় উক্ত ইমামের তাকলীদ করা বা তার মাযহাব মানা বা তার অনুসরণ করা। অতএব সাধারন মানুষদের জন্য যারা কোরআন হাদিস বোঝেনা তাদের জন্য তাকলীদ করা বা মাযহাব অনুসরণ করা ওয়াজিব।
সৌদি আরবের একজন শায়েখ নাম তার শায়েখ ছলে আল উসাইমিন রহিমাহুল্লাহ তিনি বলেন জনসাধারণ মানুষদের জন্য মাযহাব মানা ফরজ। তবে যে কোন একজন ইমামকে অনুসরণ করতে হবে। একসাথে একাধিক ইমামের অনুসরণ করা যাবে না। তাহলে সেটা নিজের খাহেশাতের অনুসরণ হবে।

ইতিহাসে অনুরূপ বিজ্ঞ মুজতাহিদ ইমাম অনেকে অতিবাহিত হয়েছেন। তাদের মধ্যে বিশেষ করে চারজন ইমাম ব্যাপকভাবে গ্রহনযোগ্যতা লাভ করেছেন এবং তাদের মাযহাব ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়ে আসছে। উক্ত চার ইমাম হলেন
ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ
ইমাম শাফি রহিমাহুল্লাহ
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহ
ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ
এই চার জনের মাযহাবকে হানাফি,শাফেয়ী, মালেকি, ও হাম্বলী মাযহাব বলে। আর উপমহাদেশের মুসলমানসহ সারা দুনিয়ার অধিকাংশ মুসলমান ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ এর মাযহাবের অনুসারী। আল্লাহ আমাদের সঠিক বোঝার তৌফিক দান করুন।

ইবাদাত ও শরীয়তের প্রকার সম্পর্কে আকিদা

শরীয়তের ইবাদত যেমন নামাজ,রোজা,হজ্ব,যাকাত আদায় করা যেমন ফরজ। তেমনি ভাবে ইসলামের মুয়ামালা ও মুয়াশারার বিধান রক্ষা করা তেমন ফরজ। এই বিষয়গুলো থেকে আমরা অনেক দূরে রয়েছি। আমরা মনে করি শুধু নামাজ রোজা আদায় করলেই চলবে বাকি গুলোর দরকার নেই অথচ এগুলোর বিধান রক্ষা করাও ফরজ।
মুয়ামালা যেমন-লেনদেন,হালাল ব্যবসা-বাণিজ্য,হালাল পন্থায় বিবাহ করা,মসজিদ সংক্রান্ত নীতিমালা বিভিন্ন পেশা হালাল ভাবে সুন্নত তরিকায় করা।
মুয়াশারা যেমন আচার,আচরণ শিষ্টাচার,মানবাধিকার,সংস্কৃতি সমাজনীতি,রাজনীতি,সালাম,কালাম,ইত্যাদি পালনীয় বিষয় । এই জাহেরি

এবাদত এর পাশাপাশি বাতেনি ইবাদাত তথা এখলাস আত্মশুদ্ধি ইত্যাদির ওপর ও আমল করা জরুরী।

কিছু আধুনিক বিষয় সম্পর্কে আকিদা

জনগণকে সকল ক্ষমতার উৎস মানা এটা ঈমান পরিপন্থী আকিদা। এটা বিশ্বাস করা যাবে না। কারণ সকল ক্ষমতার মালিক হলেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। আমাদের সমাজে প্রচলিত গণতন্ত্রে যেহেতু জনগণকেই সকল ক্ষমতার অধিকারী মানা হয়। বিধায় ইসলামে গণতন্ত্র জায়েজ নেই।
ডারউইন এর মতবাদ বিশ্বাস করা কুফরী। তার মতবাদ হল মানুষ বানর থেকে এসেছে। অথচ মানুষ হযরত আদম (আ:) এর বংশধর এবং তার থেকেই মানুষের বিস্তার ঘটেছে। বিধায় ডারউইন এর মতবাদ বিশ্বাস করা যাবে না।
নেককার ও বদকার সকলের জানাযা পড়তে হবে এটাই ইসলামের মূলনীতি। যদি সে আহলে কেবলার অধিকারী হয়।
মুসলমানদের ক্ষতি দূর করার জন্য কিছু ভালো জাদু শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়া কুফরি নয়। বরং কুফরি হলো জাদুতে বিশ্বাস করা ও তদানুযায়ী আমল করা। কারণ হারুত মারুত ফেরেশতাদ্বয় বাবেল শহরে এসে প্রয়োজনবশত মানুষকে জাদু শিক্ষা দিয়েছিলেন। সাথে সাথে জাদু বিশ্বাস করতে ও তদানুযায়ী আমল করতে নিষেধও করেছিলেন।
সালফে সালেহীনদের সমালোচনা করা যাবে না। কারণ তাদের সমালোচনার দ্বারা নিজেরই ক্ষতি। আর সালফে সালেহীনদের ভালো আলোচনা করায় হক্কানী আলেমদের নীতি।

ভ্রান্ত আকিদা সমূহ

এখান থেকে কিছু ভ্রান্ত আকিদার আলোচনা শুরু হচ্ছে। যেগুলো আমাদের সমাজে প্রচলিত। সংক্ষেপে তা তুলে ধরছি। যাতে করে আমরা এগুলো বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকতে পারি। যথা:-

১। কুকুর কাঁদলে রোগ বা মহামারী আসবে মনে করা।

২। কোন বিশেষ পাখি ডাকলে বাসায় মেহমান আসবে মনে করা।

৩। এক চিরুনি দিয়ে দুজন চুল আঁচড়ালে উক্ত দুজনের মধ্যে ঝগড়া হবে বলে মনে করা।

৪। চোখ লাফালে বিপদ-আপদ আসবে মনে করা।

৫। হাতের তালু চুলকালে টাকা পাওয়া যাবে মনে করা।

৬। যাত্রা পথে পিছন থেকে ডাকাকে খারাপ মনে করা।

৭। যাত্রা পথে হোঁচট খেলে বা বিড়াল দেখলে কুলক্ষণ বলে মনে করা।

৮। অমুক দিন বিবাহ ভালো নয় অমুক দিন যাত্রা শুভ নয় মনে করা।

৯। কোনো কাজের জন্য রওয়ানা হওয়ার সময় তার সামনে হাঁচি দিলে কাজ হবে না মনে করা।

১০। পেঁচা ডাকলে বাড়িঘর বিরান হয়ে যাবে মনে করা।

১১। খাবারের সময় বা কথা বলার সময় জিহ্বায় কামড় লাগলে কেউ তাকে স্মরণ করছে বা গালি দিচ্ছে মনে করা।

১২। চড়ুই পাখিকে বালুতে গোসল করতে দেখলে বৃষ্টি হবে বলে মনে করা।

১৩। দোকান খোলার পর প্রথম কাস্টমারকে বাকি দিলে সারাদিন বাকি যাবে মনে করা।

১৪। কোন মানুষের আলোচনা চলছে এমন মানুষ হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হলে তাকে দীর্ঘজীবী বলে মনে করা।

১৫। কোন ঘরে মাকড়সার জাল বেশি হলে ঘরের মালিক ঋণগ্রস্ত হবে বলে মনে করা।

১৬। আসরের পর ঘর ঝাড়ু দেওয়াকে কুলক্ষণ মনে করা।

১৭। ঝাড়ুদ্বারা বিছানা পরিষ্কার করলে ঘর উজাড় হয়ে যাবে মনে করা।

১৮। কোন বাচ্চা মারা গেলে ওই বাড়িতে গেলে নিজের বাচ্চাও মারা যাবে।

১৯। ঝাড়ুর আঘাত লাগলে শরীর শুকিয়ে যাবে মনে করা।

২০। কোনো প্রাণীর ডাককে অশুভ মনে করা।

২১। রাতে আয়নায় চেহারা দেখাকে মন্দ মনে করা।

২২। রাতে প্লেটের ঝুটা পানি ফেলা কে মন্দ মনে করা।

২৩। রাত্রে ঘর ঝাড়ু দেওয়াকে মন্দ মনে করা।

২৪। পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পূর্বে ডিম খাওয়া যাবেনা তাহলে পরীক্ষায় জিরো(শূন্য) পাবে মনে করা।

২৫। জমজ কলা খেলে জমজ সন্তান হবে মনে করা।

২৬। রাতে নখ বা চুল কাটা কে অলক্ষণ মনে করা।

২৭। কোরআন শরীফ হাত থেকে পড়ে গেলে আড়াই কেজি চাল দিতে হবে মনে করা।

২৮। ঘর থেকে বের হয়ে বিধবা মহিলার মুখ দেখলে যাত্রা অশুভ হয় মনে করা।

২৯। রাতের বেলা কাউকে সুই-সুতা দিতে নাই মনে করা।

৩০। হাত থেকে প্লেট পড়ে গেলে বাড়িতে মেহমান আসবে বলে মনে করা।

৩১। মহিলারা হাতে চুড়ি বা বালা না পড়লে স্বামীর অমঙ্গল হবে মনে করা।

৩২। বিনা অজুতে বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানীর নাম নেওয়া যাবে না।

৩৩। মেরাজের রজনীতে আল্লাহ রাসূল (সা:) কে ৯০ হাজার কালাম দিয়েছে যার ৩০ হাজার আলেমরা জানে। আর বাকি ৬০ হাজার পীর ফকিররা জানে মনে করা।

৩৪। পৃথিবী নাকি ষাড়ের সিংহের উপরে বিদ্যমান।

৩৫। কবরের প্রথম কোপের মাটিকে নিশানা হিসেবে ব্যবহার করা।

৩৬। নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায় ডান পায়ের বৃদ্ধা আঙ্গুল নড়াচড়া করলে নামাজ নষ্ট হয়ে যায় মনে করা।

৩৭। কুরবানি দিতে অক্ষম ব্যক্তির জন্য মুরগী,হাঁস কুরবানী দেওয়া লাগবে মনে করা।

৩৮। সালাম ও মুসাফার পর বুকে হাত রাখা।

৩৯। একসাথে মোনাজাত শুরু করা এবং একসাথে মোনাজাত শেষ করাকে আবশ্যক মনে করা।

৪০। মৃত বুজুর্গ ব্যক্তিদের আত্মা দুনিয়াতে ঘুরে বেড়ায় এবং মানুষের প্রয়োজন মেটায়।

৪১। মৃত ব্যক্তির বাড়িতে আগুন জ্বালানো নিষেধ মনে করা।

৪২। রাত্রে সুই বিক্রি করা অশুভ মনে করা।

৪৩। স্বামীর নাম মুখে নিলে স্ত্রী তালাক হবে মনে করা।

৪৪। ইস্তেখারা করার জন্য রাত হতে হবে এবং ঘুমাতে হবে এমন এমন মনে করা।

৪৫। সুরমা তুর পাহাড়ের তাজাল্লি থেকে তৈরী।

৪৬। জানাজার নামাজের আগে মৃত ব্যক্তি ভাল ছিল এই সাক্ষ্য নিলে সে মাফ পাবে বলে মনে করা।

৪৭। তারাবির নামাজ না পড়লে রোজা হবে না মনে করা।

৪৮। চাশতের নামাজ ছুটে গেলে মানুষ অন্ধ হয়ে যাবে মনে করা।

৪৯। হজে মহিলাদের পর্দা করতে হয় না মনে করা।

৫০। হাঁটুর কাপড় সরে গেলে ওযু ভেঙে যায় মনে করা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিরক এর আলোচনা শুরু হচ্ছে

সম্মানিত পাঠক এখান থেকে শিরক এর আলোচনা শুরু হচ্ছে। কারন শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ যা তাওবা ব্যতীত ক্ষমা করা হয় না। এই অধ্যায়ে আমরা বিস্তারিত ভাবে শিরক নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

(ক) শিরক কাকে বলে ?

(খ) শিরক কত প্রকার ও কি কি?

(গ) আমাদের সমাজে প্রচলিত শিরক সমূহ

প্রথম বিষয়

শিরক কাকে বলে

উত্তর =শিরক অর্থ অংশীদার হওয়া। ইসরাক অর্থ অংশীদার করা বা বানানো। সাধারণ ভাবে শিরক শব্দটিকে ও আরবিতে অংশীদার করা অর্থে ব্যবহার করা হয়।

শরীয়তের পরিভাষায় শিরক বলা হয় রুবুবিয়্যাত অথবা তার পবিত্র নাম ও গুনাবলি অথবা তার ইবাদতের ক্ষেত্রে অন্য কাউকে অংশীদার বানানো কে শিরক বলে। সংক্ষেপে শিরক বলা যায় রব ও ইলা হিসেবে আল্লাহর সহিত অন্য কাউকে শরীক সাব্যস্ত করাকে শিরক বলে।

দ্বিতীয় বিষয়

শিরক কত প্রকার ও কি কি

উত্তর=শিরক দুই প্রকার যথা

(ক) শিরকে আকবার (খ) শিরকে আসগর

শিরকুল আকবার তথা বড় শিরক আবার তিন প্রকার

(ক) শিরকে রুবুবিয়্যাহ তথা প্রতিপালনে শিরক

অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সৃষ্টি বা প্রতিপালনের বিষয়ে আল্লাহর সাথে শরিক করা। যেমন রিজিক দান করা, মৃত্যু দেয়া, জীবন দান করার ক্ষমতা অন্য কারো মধ্যে আছে বলে বিশ্বাস করা।

(খ) শিরক ফিল আসমায়ি ওয়াস সিফাত তথা নাম ও গুণাবলীতে শিরক। অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্র নাম গুণাবলী রয়েছে। এ সকল নাম ও গুণের ক্ষেত্রে কোন সৃষ্টিকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা। কারণ আল্লাহকে কারো সাথে তুলনা করা যায় না।

(গ) শিরক ফিল ইবাদাত তথা ইবাদতে শিরক। অর্থাৎ ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বলে বিশ্বাস করাকে ইবাদতের শিরক বলে।

শিরকে আজগর তথা ছোট শিরক আবার কয়েক প্রকার:-

১। রিয়া বা লোক দেখানোর জন্য ইবাদত করা। মানুষকে দেখানোর জন্য ইবাদত করা।

২। অছিলা বা উপকরণ বিষয়ে শিরক যেমন কেউ মনে করল অমুক রাশির কারণে বা প্রভাবে বৃষ্টি হয়েছে বা অমুক রাশিতে চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণের ফলে অমুক কাজটি ঘটেছে।

কারণ মুমিন ব্যক্তি মনে করেন এই সবকিছু হয় আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায়। কোন রাশি বা গ্রহ,নক্ষত্রের কারণে নয়।

৩। আল্লাহর সমকক্ষ জ্ঞাপক বাক্য বলা। যেমন কেহ বলল যে আল্লাহর ইচ্ছা ও ভালো বৃষ্টিপাতের কারণে ফসল এত সুন্দর হয়েছে। তাহলে সে ছোট শিরক করেছে। কারণ সে আল্লাহর ইচ্ছা এবং ভালো বৃষ্টি উভয়টাকেই উপকরণ হিসেবে মেনেছে ফসল ভালো হওয়ার জন্য। এখানে আল্লাহর ইচ্ছার সাথে ভালো বৃষ্টিপাত শব্দকে উল্লেখ করা ঠিক হয় নি।

৪। গাইরুল্লাহর নামে শপথ করা। অর্থাৎ আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা।

৫। অশুভ বা অমঙ্গল বিশ্বাস করা। ইসলামে কোন শুভ বা অশুভ বলতে কিছুই নেই। বরং ভালো,মন্দ,কল্যাণ,অকল্যাণ শুভ,অশুভ এই সবকিছুর মালিক আল্লাহ। তিনি যা চান তাই করেন,তার হাতেই সব।

৬। ভবিষৎদ্বক্তা বা ভাগ্যবক্তার কথা বিশ্বাস করা। ইসলামে গণক,ঠাকুর,জ্যোতিষী,রাশিবিদ,হস্তরেখাবিদ বা যেকোনো গোপন জ্ঞানের দাবিদার বা ভবিষ্যতের জ্ঞানের দাবিদারের নিকট যেতে নিষেধ করা হয়েছে। তাদের কথা বিশ্বাস করাকে শিরক বলা হয়েছে।

৭। কাউকে শাহানশা বলা। কারণ হাদিস শরীফে উল্লেখ রয়েছে যে কাউকে রাজাধিরাজ বা শাহানশাহ বলা যাবে না।

৮। কাউকে রব্ব বা আবদ বলা। কাউকে রব্ব বা আবদ বলা যাবে না। কারণ হাদিসে এগুলোকে বলতে নিষেধ করা হয়েছে।

৯। সুতা,রশি,তাবিজ ব্যবহার করা।

যদি মনে করা হয় এই গুলোই ক্ষতি বা ভালো করার ক্ষমতা রাখে তাহলে এগুলো ব্যবহার করা নিষেধ। এক কথায় অন্ধ বিশ্বাস করা এগুলোর প্রতি ।

আমাদের সমাজে প্রচলিত শিরক সমূহ

১। কোন পীর মুর্শিদ সম্পর্কে এই আকিদা রাখা যে তিনি সব সময় আমাদের অবস্থা জানেন। তিনি হাজির নাজির।
২। কোন পীর বুযুর্গকে দূর দেশ থেকে ডাকা এবং মনে করা যে তিনি ডাক শুনতে পেরেছেন।
৩। কোন পীর বা বুযুর্গর কবরের নিকট গিয়ে সন্তান চাওয়া।
৪। পীর বা কবরকে সিজদা করা।
৫। কোন বুযুর্গের নাম অজিফার মত জোপা।
৬। বুযুর্গের নামে শিরনি বা মান্নত করা।
৭। কোন পীরের নামে জন্তু-জানোয়ার যবেহ করা।
৮। গাইরুল্লার নামে কসম খাওয়া।
৯। হোসাইন বখস নাম রাখা।
১০। নক্ষত্রের প্রভাব বিশ্বাস করা।
১১। গনক বা ঠাকুরের নিকট হাত দেখিয়ে অদৃষ্ট বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা, ও ভবিষ্যৎ বাণী ও গায়েবের খবর বিশ্বাস করা ।
১২। কোন জিনিস দেখে কুলক্ষণ ধরা বা কুযাত্রা মনে করা ।
১৩। কোন দিন বা মাসকে অশুভ মনে করা।
১৪। মুহাররমের তাজিয়া বানানো।
১৫। এরকম বলা যে উপরে আল্লাহ আর নিচে আপনি।

১৬। কষ্ট না করলে কেষ্ট পাওয়া যায় না।

১৭। কোন পীর বুযুর্গ বা দেও পরী বা ভূত পেতকে লাভ ও লোকসানের মালিক মনে করা।

১৮। কোন পীর বুযুর্গের দরগা বা কবরের চতুর দিক দিয়ে তওয়াফ করা।

১৯। কোন পীর বুযুর্গের দরগা বা বাড়িকে কাবা শরীফের মত তাজিম বা সম্মান করা।

২০। রাসুল (সা:) গায়েব জানেন বলে বিশ্বাস করা।

২১। রাসুল (সা:) কে সেজদা করা।

২২। রাসূল এর নাম নিয়ে জিকির করা।

২৩। মাজারের ব্যক্তিরা গায়েব জানে বলে বিশ্বাস করা।

২৪ মাজারের মাটি,গাছ বা পুকুরের পানি উপকার করতে পারে বলে বিশ্বাস করা।

২৫। পীর কে নাজাতের অসিলা বানানো।

২৬। পীরকে আল্লাহ ও বান্দার মাঝে মধ্যস্থকারী মনে করা।

২৭। পাপ করা বৈধ বলে বিশ্বাস করা।

তৃতীয় অধ্যায়

বিদআতের আলোচনা

এখান থেকে বিদআতের আলোচনা শুরু হচ্ছে। বিদআত থেকে বাঁচার জন্য এগুলো জানা জরুরী। অন্যথায় এখান থেকে বাঁচা সম্ভব নয়। আমাদের সমাজে আনাচে-কানাচে বিদআত ছড়িয়ে পড়েছে। এগুলো আমাদের জানা দরকার এবং তা থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য।

(ক) বিদআতের পরিচয় কি ?

(খ) বিদআত কত প্রকার ও কি কি ?

(গ) আমাদের সমাজে প্রচলিত বিদআত সমূহ ।

প্রথম বিষয়

বিদআত এর পরিচয়

বিদআত অর্থ নব উদ্ভাবিত বিষয়। অনিস্তত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করা বা উদ্ভাবন করা।

শরীয়তের পরিভাষায় বিদআত বলা হয় দিনের মধ্যে এবাদত মনে করে এবং অতিরিক্ত ছওয়াবের আশায়, এমন কিছু আকিদা বা আমল সংযোজন ও বৃদ্ধি করা, যা রাসূলের যুগে,সাহাবী ও তাবেঈনদের যুগে ছিল না। তাকে বিদআত বলে।

তবে পরে যেসব নেক কাজের প্রেক্ষাপট সে যুগে ছিল না, কিন্তু পরবর্তিতে নতুন প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হওয়ায়, নতুন আঙ্গিকে দ্বীনের কোন কাজ করা হয়, সেটাকে বিদআত বলা যায় না । যেমনঃ প্রচলিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিদআত কত প্রকার ?

শরীয়তে ইসলামে বিদআতের কোন প্রকার নেই। কারন বিদআত তো বিদআত,সেটার আবার ভালো মন্দ কিসের। বিদআত পুরোটাই মন্দ তার ভালো কোন দিক নেই। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন প্রত্যেক বিদআত গোমরাহী,আর প্রত্যেক গোমরাহী পথভ্রষ্টতা অতএব বিদআতে হাসানা বা সায়্যিআহ বলে কোন প্রকার নেই। এটাই জুমহুর মুহাক্কিক আলেমদের মত। তবে অনেকেই বিদআতকে দুই ভাগে ভাগ করেন

১। বিদআতে হাসানা ২। বিদআতে সায়্যিআহ

আসলে মূলত এভাবে ভাগ করা যাবে না। তবে যারা এভাবে ভাগ করেছেন এটা শাব্দিক অর্থে ,পারিভাষিক অর্থে নয় ।

তৃতীয় বিষয়

আমাদের সমাজে প্রচলিত বিদআত সমূহ
১। জন্ম বার্ষিকী ও মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা।
২। কোন বুযুর্গের মাজারে ধুমধামের সাথে মেলা বসানো।
৩। মৃত ব্যক্তির জন্য কুলখানি করা অর্থাৎ চতুর্থ দিনে ঈসালে ছওয়াব করা।
৪। কোন মাজারে ওরস করা।
৫। কোন মাজারে কাওয়ালী গান গাওয়া ।
৬। মৃত ব্যক্তির চল্লিশা পালন করা।
৭। কবরের উপরে ফুল দেয়া ।
৮। কবরের উপরে চাদর বা লাল কাপড় দেয়া।
৯। কোন বুযুর্গের কবরের উপরে গম্বুজ বানানো ।
১০। কবর জাক-জমকভাবে পাকা করা।
১১। মাযারে মিঠাই বা সিরনি নজরানা দেয়া।
১২। আমাদের সমাজে প্রচলিত মিলাদ অনুষ্ঠান।
১৩। মিলাদ অনুষ্ঠানে কিয়াম করা।
১৪। জানাযার নামাজ আদায় করার পর আবার হাত উঠিয়ে দোয়া করা।
১৫। জানাযার নামাজ আদায় করার পর খাটিয়া বহন করার সময় কালিমায়ে শাহাদাত পড়া।
১৬। দাফনের পর কবরের কাছে আজান দেয়া।

১৭। ঈদের নামাযের পর মুসাফা বা কোলাকুলি করা ।
কারণ সমাজে এটার প্রচলন বেশি দেখা দিতেছে, বিধায় এটা থেকে বিরত থাকাই উত্তম।
১৮। আযান ও একামতের মাঝে রসূলের নাম এলে বৃদ্ধা আঙ্গুলে চুমু দিয়ে চোখে লাগানো।
১৯। রমজানের শেষ জুমায় খুতবায় বিদায় সূচক শব্দ উল্লেখ করা যেমন জুমুআতুল বিদা বলা।
২০। খাটিয়ার কাপরের উপর কালিমা লেখা বা ফুলের চাদর বিছানো।
২১। শবে বরাতের রাত্রে হালুয়া রুটি বা শিরনি বিতরণ করা।
২২। আজানের পর হাত উঠিয়ে দোয়া করা।
২৪। কবরের উপর মাজারের নামে ঘর তৈরি করা।
২৫। আজান ও ইকামতের শুরুতে দরুদ সালাম পড়া।
২৬। ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন করা।
২৭। কদমবুচি করাকে সুন্নত মনে করা।
২৮। ঢিলা-কুলুক নিয়ে ৪০ কদম হাঁটাহাঁটি করা।
২৯। কোন মানুষ কে গাউসুল আজম মনে করা।
৩০। রবিউল আউয়াল মাসে নবীজির জন্ম দিবস উপলক্ষে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা।
৩১। কবরের পাশে লোক দিয়ে কোরআন তেলাওয়াত করানো ।
৩২। কবর অতিক্রম করার সময় হাতে চুমু খাওয়া।
৩৩। মেয়ের অভিভাবক কে নির্দিষ্ট সংখ্যক মেহমানদারিতে বাধ্য করা।

সমাজে প্রচলিত কুপথা ও কুসংস্কার

আমাদের সমাজে প্রচলিত কুপ্রথা ও কুসংস্কারের আলোচনা শুরু হচ্ছে। আমরা এগুলো থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

১। বিবাহের সময় সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও সমস্ত সামাজিক প্রথা মানতে এবং অপব্যয় করতে বাধ্য করা হয়।

২। কোন হালাল পেশাকে অপমানের কারন মনে করা যেমন- দর্জির পেশা বা তেল লবণের দোকান করা।

৩। বিধবা বিবাহকে দোষনীয় মনে করা।

৪। নসব বা বংশের গৌরব করা।

৫। বিবাহ শাদিতে হিন্দুদের রসম পালন করা।যেমন:- ফুল দিয়ে বউ বরণ করা, ভরা মজলিসে বউয়ের মুখ দেখানো,গীত গেয়ে নারী পুরুষ একত্র হয়ে বর কনেকে গোসল করানো। বিবাহের মজলিসে এসব গুনাহের কাজ করার দ্বারা বিবাহের বরকত নষ্ট হয়ে যায়।

৬। মৃত ব্যক্তির ব্যবহৃত কাপড় চোপড়কে দোষনীয় মনে করা।

৭। বিনা প্রয়োজনে কুকুর পোষা।

৮। বিবাহ শাদী ইত্যাদি অনুষ্ঠানে হাদিয়া উপঢৌকন দোয়া। কারণ না দিলে অসম্মান হয় দুর্নাম হয় কিংবা তার অমুক অনুষ্ঠানে দিয়েছিল এখন আমরা না দিলে কেমন হয় ইত্যাদি নিয়তে দেয়া হয়। এগুলোর পিছনে কোন ভালো নিয়ত থাকে না।

৯। আশুরায় খিচুড়ি ও শরবত তৈরি করে বিতরণ করা।

১০। শবে বরাত ও শবে কদরের রাত্রি জাগরনের জন্য ফরজ,ওয়াজিব থেকে বেশি গুরুত্বসহকারে লোকদের সমবেত করার উদ্যোগ নেয়া।

১১। শাব্দিক অর্থে ঈদ মোবারক বলা খারাপ ছিল না। কিন্তু এটা রছমে পরিণত হয়েছে বিধায় পরিত্যাগ করাই উত্তম।

১২। ঈদগাহে বা মসজিদে যাওয়ার আগেই জায়নামাজ বিছিয়ে জায়গা দখল করা।

১৩। মসজিদ,মাদ্রাসার জন্য বা অন্য কোন ধর্মীয় কাজের জন্য এমন ভাবে চাঁদা আদায় করা যে মানুষ গরমে বা চাপে পড়ে দান করে।

১৪। বিপদে আপদে পড়লে দান ছদকা করলে বিপদ দূর হয়,এটা ঠিক কিন্তু এটা বলা যে জানের বদলে জান সদকা করতে হবে। এটা একটি রসম। বরং যে কোনো কিছু দান করলেই হবে।

১৫। তারাবির দিনে কোরআন খতম করার সময় মিষ্টি বিতরণ করা।

১৬। মাইয়েতের জন্য ইসালে সওয়াব করা ভালো কিন্তু সেটা সবাই সম্মিলিত হয়েই করতে হবে, অন্যথায় হবে না এরূপ বাধ্য বাধকতার পিছনে পড়াও রছমে পরিণত হয়েছে।

১৭। সালাম বা মুসাফার পর বুকে হাত রাখা।

১৮। পায়ের বৃদ্ধা আঙ্গুল দিয়ে কাতার সোজা করা।

১৯। অপরিচিত ব্যক্তিকে সালাম না দেওয়া।

২০। সালাম দেয়ার সময় মাথা ও সিনা ঝুকানো।

২১। নামাজে যেখান থেকে ইচ্ছা কাতার সোজা করা।

২২। বৃষ্টি বর্ষণের জন্য ব্যাঙের বিয়ে দেওয়া।

২৩। সামনের কাতার খালি রেখে পিছনে দাঁড়ানো।

২৪। ইসলামে নাকি সাংস্কৃতি নাই।

২৫। ফাতিহায়ে ইয়াযদহম এর প্রচলন।

২৬। প্রবল বৃষ্টি বন্ধের জন্য আজান দেওয়া।

২৭। দিনের প্রথম উপার্জনকে ভক্তি জানানো।

২৮। শশুরবাড়ি প্রবেশের সময় নববধূর পা ধোয়ানো।

২৯। খতম সমূহ ইমাম সাহেবদের মাধ্যমে বখশানোকে জরুরি মনে করা।

৩০। তাওয়াফের সাত চক্করের জন্য আলাদা আলাদা দোয়া আছে মনে করা।

৩১। রাতে সুই বিক্রি করাকে অশুভ মনে করা।

৩২। কোন কথা বলার সময় এই কথা বলা মহাভারত কি অশুদ্ধ হয়ে যাবে।

৩৩। কার মুখ দেখে বের হয়েছিলাম বলা।

৩৪। আসরের পর কিছু খাওয়াকে মন্দ মনে করা।